বাংলার জেলে-মাঝিদের লৌকিক দেবদেবী ও উৎসব-পার্বণ

দূর্বাদল দে

(১)

বাংলার ইতিহাসে একাধারে আঞ্চলিক বৈষম্য ও অন্যদিকে জাতিগত বৈচিত্র্য প্রমাণিত সত্য। পেশা নির্ভর বাঙালি জনগোষ্ঠীর বহুবিচিত্র (লৌকিক) সংস্কৃতি ছড়িয়ে রয়েছে বাংলার আনাচে-কানাচে। এদেশ নদী নির্ভর -- নদীমাতৃক। বাংলার জেলে-মাঝিরা যেন সেই নদীমাতৃকারই আত্মজ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জেলে-মাঝিদের উৎসব পার্বণে, ধর্মাচরণে বা দেব-দেবীত্বে পার্থক্য যেমন চোখে পড়ে তেমনই পেশাগত গড়ন তাদেরকে সর্বজনীন অনুভূতিতে একীভূতও করে। আমরা তাদের বিচিত্র অন্তর্সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ দেখি তাদের লোকসঙ্গীতে, লোককথায়, লোকগাথায়। নদী-সমুদ্র, খাল-বিলের কঠোর সংগ্রাম, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, বর্ষার খেয়ালিপনা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সকল ধর্মের জেলে সম্প্রদায়কে একসূত্রে বাঁধে। ধর্মের গোঁড়ামি এখানে গৌণ। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিমূলক সংকীর্ণতার বহু ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী বাংলার এই জেলে মাঝিরা বর্তমান মেরুকরণের আবহে হয়তো হয়ে উঠতে পারে সম্প্রীতির অন্যতম পথপ্রদর্শক।

এই লৌকিক ও মানবিক ঐক্যের বুনিয়াদ নিহিত আদিকালের উৎসব-পার্বণ ও লৌকিক ধর্মাচারের শিকড়ে। গবেষক বিকাশ রায়চৌধুরী পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, মাছ ধরা হল একটি অতিশক্ত অর্থ-প্রযুক্তিগত কাজ। অগাধ জলরাশিতে মাছধরার অনিশ্চয়তার ঝুঁকি এবং পরিবেশগত বিপদের মুখোমুখি হওয়ার সময় ধীবর সম্প্রদায় মনের জোর পেতে অতি প্রাকৃত অস্তিত্বের উপর অবিচলভাবে নিয়মাবদ্ধ সমর্থন করে থাকে। তাই অতি স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে কিছুটা পরিমাণ অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করতে দেখা যায়।[১]

এপ্রসঙ্গে এস. কে. প্রামাণিক বলেছেন, যেহেতু এই রীতিগুলি আদিকাল হতে উদ্ভূত। তাই ধীবরদের আচার-অনুষ্ঠান-অনুশীলনের সঙ্গে ধর্মের সংযোগ আছে। একথা স্পষ্ট যে, এই আত্মিক বন্ধন যা থেকে এই আচার-অনুষ্ঠানগুলি উদ্ভূত, সেগুলি আবশ্যিকভাবে প্রাচীন ধর্মের গড়নের সঙ্গে সংযুক্ত।[২] এস. ভক্ত ভাটশালা

ভারতী দক্ষিণ ভারতীয় জেলে মাঝিদের মধ্যে এ সম্পর্কে লক্ষ্য করেছেন — প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব উত্তেজনা, যন্ত্রণাভোগ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ এবং প্রতিবাদ আছে। যেগুলি প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে তাদের ধর্মীয় মায়াবিদ্যার পদ্ধতিরূপে প্রতিফলিত হয়। এরূপ কিছু নির্ধারিত কার্যকলাপ যেগুলি এই পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেগুলি 'safety valve' হিসাবে কাজ করে। যে রন্ধ্র অতিরিক্ত চাপ কমিয়ে সমতা আনে।[৩]

একথা সত্য যে, ধীবরদের পেশাগত ঝুঁকি তাদের ভীষণভাবে অযৌক্তিক-অন্ধবিশ্বাসী করে তুলেছে। এই অনিশ্চিত জীবনযাপন থেকেই জন্ম 'ভয়' -এর। আর এই 'ভয়' এর বৈচিত্র বহুমুখীন প্রকাশপর্বেই সেই সুপ্রাচীন কালে জন্ম ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানব সংক্রান্ত আচার বিশ্বাসের; এমনকি দেবতারও। পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন।

(২)

বাংলার জেলে-মাঝিরা ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন বর্ণের। তবে তাদের পেশাগত ঐক্য যে অটুট তা আগেই বলেছি। নদী-সমুদ্রে মাছ ধরতে তারা যখন যাত্রা শুরু করে তখন হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবীই সমুদ্রদেবতার কাছে একই প্রার্থনা করে ঃ 'দরিয়ার পাঁচ পির বদর বদর'; হে দরিয়ার পাঁচ পীর, অনুগ্রহ করে আমাদের অঞ্জলি গ্রহণ কর। পীর সাধারণতঃ ইসলাম ধর্মে উপাস্য ধর্মগুরু। তাঁরা —গিয়াসুদ্দিন, সাম্‌সুদ্দিন, সিকান্দার, গাজী এবং কালু। সাম্প্রদায়িক ঐক্য-প্রীতির এমন চিত্র বিরলপ্রায়। আবার, বিপরীতপক্ষে, উভয় সম্প্রদায়ের জেলে-মাঝিদের মধ্যেই গঙ্গার পবিত্রতা এবং সহনীয়তা প্রসঙ্গে সুগভীর শ্রদ্ধা বিদ্যমান। এমন মেলবন্ধনে বাংলার সাধারণ জেলে মাঝিদের হয়তো বা অসাধারণত্বে উন্নীত করে।

দরিয়ার পাঁচপিরের কাছে এই সাধারণ (general / generalize) প্রার্থনার পাশাপাশি বাংলার জেলে-মাঝিদের লোকায়ত দেবদেবীর অস্তিত্ব বহুমুখী। নদী-সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে তারা আড়ম্বরপূর্ণভাবে মাকাল ঠাকুরের পুজো করে। মাকাল হল প্রকৃতপক্ষে মহাকাল; আর বিশেষতঃ হিন্দু জেলে-মাঝিদের দৃঢ় বিশ্বাস, যদি তারা মহাকালকে পুজো দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারে তাহলে তাদের সাফল্য নিশ্চিত। মাছ ধরার পরিমাণ হবে তাদের অপ্রতুল। বাংলার উপকূলের জেলে-মাঝিরা আটেশ্বর গঙ্গাকে পুজো দিতে অভ্যস্ত। বিপরীত যাত্রার ক্ষেত্রে অর্থাৎ মাছ ধরে ফেরার কালে বাংলার জেলেরা বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবারে একটি বিশেষ পুজো করে থাকে; তা বনবিবি বা বিশালাক্ষী দেবীর

পুজো। উল্লেখ্য, যে মুসলিম বা খ্রিস্টান ধর্মের জেলে-মাঝিরা এই পূজোয় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করলেও পুজো উদ্‌যাপনে সহায়তা করে (চাঁদাপত্র দেয়)। হিন্দু মৎস্যজীবীরা তাদের নৌকাকে এসময় সিঁদুর দিয়ে সাজায় আর মুসলিম এবং খ্রিস্টান মৎস্যজীবীরা যথাক্রমে মসজিদ ও গির্জায় প্রার্থনায় অংশ নেয়।

বাংলার এই জেলে-মাঝি সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোনও দেবদেবী নেই। মা শীতলা জলবসন্ত রোগের বিভাগীয় দেবী হিসাবে এবং কালীর অপর রূপ দেবী চণ্ডী মৎস্যজীবীদের সমাজে বিশেষ ভক্তিভাবে পুজো দেওয়া হয়। এই দুই দেবীকেই সাধারণ-দৈনন্দিন যেকোনও উপলক্ষ্যে পুজো দেওয়া হয় আতপ চাল, মিঠাই, ফলমূল, ছোট ছোট মুদ্রা একত্রিত করে। এমনকি পুজো উপলক্ষে সমাজে পাঁঠা বলিরও চল আছে। উপহার দেওয়া হয় — নতুন কাপড়, গহনা ইত্যাদি। রোগ-গ্রস্ত বা দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষ মনস্কামনা পূর্ণ করতে দেবীকে সাক্ষী করে স্বেচ্ছাকৃত 'মানত' পূরণ করে বিশেষ সৌভাগ্যের জন্য। তবে, জেলে-মাঝিদের লৌকিক এই দেবীগণের এমন কৌলিন্য বা মর্যাদা নেই যে তাদের নিজস্ব কোনও মন্দির বা বিগ্রহ (মূর্তি) আছে। এমনকি তাদের জন্য পুরোহিতও নির্দিষ্ট নেই। একটি অমসৃণ পাথর ফলকের টুকরো অশ্বত্থ বা বট গাছের তলায় স্থাপন করা হয় দেবীদের প্রতিমূর্তি স্বরূপ। তাকে মাখানো হয় তেল-সিঁদুর; স্নান করানো হয় দুধ-ঘি দিয়ে। এভাবেই লৌকিক দেবীরা সমাজের মনে অস্পষ্ট-ভয়াল-ভয়ঙ্কর-ক্ষমতাশালী হিসাবে ছাপ ফেলে। পূর্ণ হয় লৌকিক দেব-দেবীত্বের বৈশিষ্ট্য নির্ভর এহেন বৃত্ত। রোগভোগ বা মৃত্যুশঙ্কায় ভীত সম্প্রদায় রক্ষার তাগিদে নির্দিষ্ট সময়ের পর্যায়বৃত্ত প্রসন্ন করার অভিপ্রায় সন্তুষ্ট রাখতে চায় তাদের উপাস্য দেব-দেবীদের।

অপর এক গ্রাম দেবতা ও গ্রামদেবী বাংলার জেলে-মাঝিদের দ্বারা পূজিত হন তাঁরা হলেন বুড়া-বুড়ি যা আক্ষরিক অর্থে একজন বৃদ্ধ এবং একজন বৃদ্ধা। পূর্ব-বাংলার একটি অতিপরিচিত উভলিঙ্গ দেবতা প্রাচীন বিশ্বাস ব্যবস্থা থেকে ধরে নেওয়া হয় যে হিন্দু ধর্ম তাঁকে গ্রহণ করেছিল। বুড়া-বুড়ির এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয় – পৌষ সংক্রান্তিতে।

বার্ষিক গঙ্গাপূজা ধীবরদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। রায়চৌধুরী মনে করেন নির্জন দ্বীপের একঘেয়েমি কাটাতে সকল ঘুঁটি থেকে চাঁদা তুলে এ পূজা হয়। এর ব্যবস্থাপনায় বাহারদার (দলনায়ক) অথবা সরকারি কর্তব্যরত আধিকারিকেরা থাকেন। যদিও মুসলিম এই অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে না। তবুও তাদের এই

অনুষ্ঠানে চাঁদা দিতে হয় এবং অনুষ্ঠানে তারা উপস্থিত থাকে। তবে কিছু উৎসাহী মুসলিম যুবক এই বার্ষিক গঙ্গা পূজার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। দেবীমূর্তি নেওয়া হয় শহর/শহরতলি থেকে। মা গঙ্গা হলেন চতুর্ভুজ দেবীমূর্তি। তিনি মকরের উপর অধিষ্ঠাত্রী। মকর হল কাল্পনিক সামুদ্রিক প্রাণী - গঙ্গার বাহন। যারা মূর্তি সংগ্রহ করতে পারে না তারা 'ঘট' দিয়েই পুজো করে।

সমরেশ বসু তাঁর 'গঙ্গা' উপন্যাসে বার্ষিক গঙ্গা পুজো সম্পর্কে বলেছেন 'সাজার' হল মাছমারাদের সর্বজনীন গঙ্গাপূজা। সবাই মিলে চাঁদ দেয়। হাতে ধরে কেউ টাকা পয়সা দেয় না। যাদের উপর সাজারের ভার থাকে তাকে বলে 'সাজাভাটা'। সেই মাছ বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায় তাতেই সর্বজনীন গঙ্গা পুজো হয়। তাতে মাছ প্রদানের ভেদাভেদ নাই। যে যা পায়, সে তাই দেয়। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে বৈকি! যে যত বেশি গড়ান মাছ মারতে পারে সে তত বেশি দিতে পারে। তার সুনাম হয়; মান বাড়ে। বর্তমানে, দীঘা-মোহনার পৌষ সংক্রান্তি এবং মাঘ মাসের শুরুতেই প্রতিবছর গঙ্গোৎসব জেলে-মাঝি তথা এলাকার মানুষের কাছে এক বড় আকর্ষণ বাংলার জেলে-মাঝিরা গঙ্গা বলতে কিন্তু বোঝে দেবী গঙ্গা — নদী গঙ্গা এমনকি সমুদ্র-গঙ্গাকেও।

একথা কৌতূহলোদ্দীপক যে, বাংলাদেশী ধীবররা বনবিবি নামক দেবীর কথা যেভাবে জানে না অথচ পশ্চিম বাংলায় এই দেবী জেলে-মাঝিদের মধ্যে অতি পরিচিতা। বাংলাদেশী জেলেরা এদেশে আসার পর মুসলিম অনুসর্গ 'বিবি' হিন্দু অনুসর্গ 'দেবী' তে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এদেশীয় ধীবররা তাঁর নামের পরিবর্তন ঘটায়নি। বনদেবী হলেন বিষাক্ত সাপ, বাঘ ও অন্যান্য বুনো জীব-জন্তুর উপর কর্তৃত্বকারিণী দেবী। সুন্দরবন হল এই জীবজন্তু অধ্যুষিত এলাকা। মাছ ধরার পাশাপাশি জ্বালানি সংগ্রহতেও এ পেশার মানুষেরা ব্রতী হয়, তাই তারা তাঁকে পুজো করে শান্ত রাখতে চায়। তাদের কাছে বনদেবীর স্থান সুউচ্চ।

প্রামাণিকের মতে, ধীবরেরা হরিলুট এবং বুড়ো ঠাকুরের পুজো করে। ত্রিনাথকে স্মরণ করে হরিলুট সম্পন্ন হয়। ত্রিনাথ হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। তারা বিশ্বাস করে এর ফলে সমুদ্রে মাছ ধরার সময় কোন বিপদ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে না। অপর পক্ষে বুড়ো ঠাকুরের (শিবঠাকুর?) পুজো এক বিশেষ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। পুজোর পূর্বরাত্রে তারা সহবাসে লিপ্ত হলে পরদিন সকালে স্নান না করে তারা জল স্পর্শ করে না। বুড়োঠাকুরের পুজোর বন্দোবস্ত এবং কার্যাদি সম্পাদন কেবলমাত্র সেই বিধবা দ্বারা হতে পারে যে নারীর রজঃস্রাব হয় না। এই

ধারণার কারণ এভাবে ব্যাখ্যা যোগ্য যে, সে নারী কাম-লালসার ঊর্ধে এবং সে পুজো করার যোগ্যা।[৬]

সমুদ্র যাত্রার আগে বাংলার জেলে-মাঝিরা সাধারনত তিন ধরনের পূজার্চনা করে। এই পুজোয় তারা দেব-দেবীর নিকট নৈবেদ্য বা অর্ঘ্য উৎসর্গ করে। তারা শনিবারে শনিপুজো করে। তাদের বিশ্বাস এই পুজো সমুদ্রে যে কোন বিপদ প্রতিহত করে। দ্বিতীয়টি সত্যনারায়ণের পুজো। এটি সম্পন্নের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে ধীবর সমাজ। গাওয়া হয় শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তনমূলক ভক্তিসঙ্গীত। সবশেষে, কিন্তু আবার সেই গঙ্গা পুজো। এটিই তাদের কাছে অধিক প্রিয় আর গুরুত্বপূর্ণও বটে। তাদের বিশ্বাস যে, তাদের জীবন, পেশা এবং মাছ ধরার সাফল্য তাঁর করুণার উপর নির্ভরশীল। যারা গঙ্গার নামে স্বেচ্ছাকৃত শপথ বা মানত করে তারা পাঁঠা বলি দেয়। অন্যেরা ফুল-ফল দিয়ে পুজো করে।[৭] একথা জেনে অবাক হতে হয় যে, বাংলার জেলে-মাঝি সম্প্রদায় মাছের পুজোও করে দেবতা জ্ঞানে। প্রামাণিক বলেছেন, ধীবরদের বিশ্বাস তারা ততক্ষণ মাছ ধরতে পারে না যতক্ষণ না মাছ নিজে এসে জালে ধরা দেয়। এসকল দেবী বা দেবতার পুজোর অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ আত্মবিশ্বাসী করে তোলে ধীবরদের।[৮]

(৩)

গবেষক প্রামাণিক বলেছেন, ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানগুলি সমাজের প্রতীকির প্রকাশ। এটি মূল্যবোধ সংরক্ষণ করতে বা চিরন্তন করতে সাহায্য করে, যার দ্বারা সমাজ নিরবিচ্ছিন্নভাবে তার প্রকাশ ঘটায়। যখন কোনও দল ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য সমবেত হয় তখন দলীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কগুলির পুনর্নবীকরণ ঘটে। তাই ব্যক্তিগত সকলের মধ্যে একটি নতুন সচেতনতার জাগরণ ঘটে। এমনিতে সাধারণ দিনে, সকলে নিজ নিজ কর্মে যোগদান করে, কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আনন্দোৎসবের দিনে তাদের চিন্তা ভাবনা রূপান্তরিত হয় ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাসে, ঐক্যবদ্ধ ঐতিহ্যে, তাদের মহান পূর্বপুরুষের স্মরণে, যা এককথায় সামাজিক বিষয়বস্তুর উপর তাদের সম্মিলিত আদর্শ মূর্ত করে। এই আচারানুষ্ঠানগুলি দলের সকল সদস্যকে প্রাকৃতিক রোষের আকস্মিক প্রকোপ থেকে, ঘৃণার বেদনা থেকে, অপরিশোধ্য ভালবাসা থেকে এমনকি হতাশা ও উৎকণ্ঠা থেকে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে, তার মানসিক ধৈর্য্য ও মানসিক সংহতির ভারসাম্য বজায় রাখতে শেখায়।[১০]

বাংলার জেলে-মাঝিদের ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান প্রধানতঃ তাদের ধর্ম ও

দেবদেবী নির্ভর। আবার এই আচারানুষ্ঠানগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে ধীবরদের সামাজিক উৎসব-পার্বণগুলির। বৃহৎ অর্থে, এদের সমাজে দেব-দেবী, ধর্মাচার ও সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসব-পার্বণগুলি একাত্মীভূত। এরা পরস্পর-পরস্পরের পরিপূরক; অন্তর্লীন সুদৃঢ় এক বন্ধনে গ্রন্থিত। তাই, কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনই দেবদেবী, ধর্মাচার প্রসঙ্গে জেলেদের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব-পার্বণ প্রসঙ্গও এসে পড়ে সহজেই।

এসকল উৎসব-পার্বণের মূল কিন্তু নিহিত সেই সুপ্রাচীন কালের আদিম সংস্কৃতির মধ্যে। একথা প্রথমাংশেই আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন মান্যা, ম্যাজি, টোটেম, ট্যাবুর সংস্কৃতির লোকায়ত প্রক্ষেপ বাংলার জেলে-মাঝিদের উৎসব-পার্বণের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ, প্রথমেই বলা যায়, মাছ ধরায় মাঝিদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই মাঝি বা তার সঙ্গীদের মন্ত্রপূত অষ্টধাতুর কবচ ধারণ করতে দেখা যায়। কবচটি সংগ্রহ করা হয় অমাবস্যার রাতে; শনিবারে। এই অনুষ্ঠানে কবচ সংগ্রহকারীকে নিরাভরণ বা পূর্ণ উলঙ্গ হতে হয়। জেলে-মাঝিরা সময় বিশেষে নিজেদের কাছে সূর্যমুখীর কাঁটা রাখে। সূর্যমুখী হল শঙ্কর মাছের লম্বা লেজের ত্রিমুখী একধরনের কাঁটা। এই তিনিটি কাঁটার মধ্যে একটি বিশেষ ধারালো এবং সেটি সূর্যালোকে বর্ণসুষমায় চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তাই, এর নাম সূর্যমুখী। এই কবচ বা সূর্যমুখী অবলম্বিত ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতাশালী বলে ধীবরদের বিশ্বাস।

প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় মানুষদের মতো এই একুশ শতকেও বাংলার জেলে-মাঝি-মল্লার নৌকার সজীবতায় বিশ্বাস করে। নৌকাকে কল্যাণকারী কোনও দেবতা বা অপদেবতার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র মনে করে বাঙালি মাঝি নৌকার কোনও বিশেষ অংশে পায়ের স্পর্শ এড়িয়ে চলে। মাড়ালেও জল দিয়ে ধুয়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে। সম্মুখ গলুই এর পর সংকীর্ণ এক অংশ ধুয়ে-মুছে, সিঁদুর লাগিয়ে, ফুল-চন্দন দিয়ে নিয়মিত পুজোর চল আছে। ২৪ পরগনায় নৌকার এই পবিত্র অংশকে 'চণ্ডী' বলে। গত শতকের মধ্যভাগে ঢাকার উপকণ্ঠে নৌকা-নির্মাণ এবং নির্মিত নৌকা প্রথম জলে ভাসানোর সময় এমনই কিছু অবশ্যপালনীয় অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দু কারিগরেরা মহা আড়ম্বরে এই অনুষ্ঠান করে কিন্তু পাশাপাশি মুসলিম কারিগরগণ তাদের রীতি অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত কিছু আচার পালন করে।[১১] 'তিতাস একটি নদীর নাম' -তে দেখি নতুন নৌকা ভাসানোর সময় পাড়ার লোকজনদের বাতাসা বিলির রেওয়াজ-উৎসব।[১২] অষ্টাদশ শতকের কবি জীবন মৈত্রের মনসামঙ্গলে নৌকার দাঁড়াপত্তনের সময় বাদ্য সহকারে পূজার্চনার ও

'ছাগ-মেষ-মহিষ' বলিদানের কথা মেলে।

"ডিঙা বান্ধে অধিকারী ভবানী স্মরণ করি
মনেতে হইয়া হরষিত।
দণ্ডিকাক দিল তুলি ছাগ-মেষ-মহিষ বলি
তবে ডিঙা গড়ে কর্মোচিত।।
নানাবাদ্যে বাজে কাড়া পত্তন দিলেন তাড়া
গল হৈতে দিল সিন্দুর ফোঁটা।
দীর্ঘ ডিঙা শতগজ প্রস্থে পঞ্চাশ গজ
ডহরা গঠিল ছান্দি গোটা।।"

নৌকা পত্তনের সময় এরকম পশুবলির রীতি বর্তমানে নাই। তবে, দক্ষিণ ভারতীয় তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলে নৌকা প্রথম জলে ভাসানোর উৎসবে চালকুমড়ো বলিদানের প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। হর্ণেলের মতে, পশু বা ফল বলিদানের প্রথাগত আচার আদিম মানুষের সেই পৈশাচিক ক্রিয়ারই বিবর্তিত রূপ।[১৩]

কৈবর্ত সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল —'জাল পালানি' অর্থাৎ জাল ফেলা থেকে বিরত থাকা। এই উৎসব শুরু হয় মাঘ মাসের শেষ দিনে। শুরু হয় একটি ক্লোজ পিরিয়ড; যার স্থায়িত্ব আড়াই থেকে সাতদিন। এই সময়কালে মাছ ধরা পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। শেষ দিনে মা গঙ্গার পুজো হয়। জালগুলি মেলে রাখা হয় নদীপাড়ে; তাতে দেওয়া হয় তেল-সিঁদুর। নদীর বিভিন্ন দেবীর প্রার্থনা করা হয়। ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করেন আর একটি ছোট ছাগল ছানা ছুড়ে ফেলা হয় জলে। পূর্ব-বাংলায় এটি ভুঁইমালী বা পাটনীদের উপরি পাওনা হয়।

একটি জালে তার বুনুনির ঘর নির্ভর করে রাশির উপর। এই রাশি হল জাল মালিকের জন্মের সময় তার গ্রহের অবস্থান। জেলেরা একথা বিশ্বাস করে যে, মাছধরা বিষয়ে সফলতা তবেই আশা করা যায় যদি রাশি নামের সংখ্যা অনুসারে জালটি তৈরি করা হয়। তাদের বিশ্বাস যে, নির্ধারিত উৎসব আর আচারানুষ্ঠান পালনের পর জালগুলি দৃষ্টিশক্তি ও অনুভূতি শক্তি পায়।[১৪] জাল তৈরিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হল 'ফুড় বাসনী'; এর দ্বারা জালে জীবন সঞ্চার করা হয়। জালের চারটি চোখ যা আলাদা করে বোনা হয়, সেগুলি মূল জালের সঙ্গে একত্র সংযুক্তি দ্বারা জালে জীবন সঞ্চারিত হয়। টেইলর এর 'সর্বপ্রাণবাদ' -এর সূত্রটি এখানে যেন খেটে যায়। জাল সংক্রান্ত এই পার্বণে তিন থেকে পাঁচজন বিবাহিতা স্ত্রীলোক মাটির প্রদীপ-সিঁদুর ইত্যাদি দিয়ে নূতন জালকে বরণ করে। এরূপ পার্ব গুলি ধীবরদের সাফল্যের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে বইকি।

সময়কাল ঃ শ্রাবণ মাস। প্রতি রাত্রে পদ্মাপুরাণের গান জেলেদের সমাজে গাওয়া হয়। একখানি ছোট চৌকিতে লাল-সালু বাঁধা পদ্মাপুরাণের পুঁথি। নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্যের পুঁথি পাঠে অধিকার নেই। সুর সহযোগে দোহার নিয়ে গাওয়া শুরু হয় এই গান। প্রধান গায়ক দিনে জালে যায়; রাত্রে গায় গান। হাতে থাকে করতাল। দুজন অপর ব্যক্তি বাজায় খোল। এক এক রাতে এক এক বাড়িতে আসর হয়। গায়েন থাকে অনেক কিন্তু প্রধান গায়েন সবার উপরে। শ্রাবণ মাস গোটাই এমন চলে আর মাস শেষে পদ্মাপুরাণ গণিত হয় শেষ। ঘরে ঘরে এবার মনসা পুজোর আয়োজন শুরু হয়।

বাংলার জেলে-মাঝিদের জীবনে অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব হল — নৌকা দৌড়। ভাদ্র মাসে শুরু হয় দুর্গা-দশমী অবধি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই উৎসব চলে। প্রতিযোগিতার সূচনা দ্বিপ্রহরের পর। নৌকার দুপাশে সারিবদ্ধ মানুষ বৈঠা হাতে বসে অংশ নেয়। এলাকাভেদে নৌকায় সারি গান গাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আলির নাম স্মরণ করে তারা নৌকা খোলে। মজার ব্যাপার এই যে এমন উৎসবগুলিতে মহিলাদেরও সক্রিয় অংশ নিতে দেখা যায়। ২৪ পরগনা জেলার নৌ-দৌড়ের উৎসব সর্বাপেক্ষা জমজমাট। এছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগুারদহ্ প্রতি দুর্গা-দশমীর পরদিন এই উৎসব আয়োজিত হয়। অংশগ্রহণকারী নৌকাগুলি সবই প্রায় মৎস্যজীবী পরিবারের।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে পিঠে-পুলির উৎসব-পার্বণ। উৎসবটি জেলে-মাঝিরা পৌষমাসের শেষ দিনে পালন করে। ৫-৭ দিন আগে থেকেই ঘরে ঘরে গুড়ি / চাল কৌটা চলে। মুড়ি ভাজা, ছাতু কোটা হয়। পার্বণের পূর্ব-রাতে সাররাত চলে পিঠে-পুলি তৈরির কাজ। সকাল হলেই খাওয়ার ধুম। সকলে মিলে খুব সকালে নদীতে স্নান সেরে আসে। যারা নৌকায় মাঝ ধরতে যায় জাল খুলে নৌকা নিয়ে তারা সকাল সকাল ফিরে আসে। গ্রামের নগরকীর্তনও শুরু হয় সকাল সকাল। সারা জেলেপাড়া ঘুরে কীর্তন চলে। কদমা-বাতাসা বিতরণ হয় মেয়েরা ঘরে বসে নানা উপাচারে পঞ্চান্ন-ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করে থাকে। আর এর পরেই আসে মাঘমণ্ডল ব্রতের উৎসব।

মাঘমণ্ডল ব্রতের সূচনা মাঘ মাসের প্রথম দিনে। চলে একমাস অর্থাৎ ত্রিশ দিন। ওই মাসের শেষ দিনে মালোপাড়ায় উৎসবের ধুম পড়ে যায়। এটি কুমারীদের ব্রত, প্রধানত ঃ তাদেরই উৎসব। কিন্তু বাড়ির ছোটরা প্রায় সকলেই এই উৎসবে অংশ নেয়। ব্রতের উদ্দেশ্য — উপযুক্ত, সুযোগ্য পাত্রে পাত্রস্থ হওয়া, সোজা

বাংলায় বললে দাঁড়ায়, ভালো বর পেতে কুমারী মেয়েরা মাঘ মাসের প্রতি প্রাতে নদীঘাটে স্নান করে, মন্ত্রপাঠ করে, পুজো দিয়ে এই ব্রত উদ্‌যাপন করে। পুজোর একাংশে বাঁশের শলা আর রঙিন কাগজ দিয়ে চৌয়ারি ঘর বানিয়ে তা মাথায় করে নদীর জলে ভাসানো হয়। ঢোল-কাঁসি বাজে। গানে অংশ নেয় মেয়েরা। ব্রতিনী মাথায় ছাতা ধরে। ছাতায় ঢালা হয় নাড়ু। নাড়ুবর্ষণের এই পর্বে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কচিকাঁচাদের মধ্যে।

শীতকালীন এইসকল উৎসব-পার্বণগুলি অতিক্রান্তের পর বাংলার জেলে-মাঝিদের হৃদয়ে রঙিন বসন্ত এনে হাজির করে আনন্দঘন সামাজিক এক উৎসবের; মালোদের বসন্ত-উৎসব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব বলে মনে করা হয়। পরিবারের সকল সদস্য এমনকি কুমারীরা বা গৃহবধূরাও এই উৎসবে অংশ নেয়। আসে ঝুড়ি ভরা আবির, গামলা ভরা রঙ। থাকে লাল-সালু। সজ্জিত এক ছোট্ট গোপাল। নাড়ুগোপাল। তারা গোপালকে রঞ্জিত করে আবিরে। শুরু হয় বসন্ত-গীত। গায়ক-গায়িকা পৃথক দল গঠনে করে — রাধার দল আর কৃষ্ণের দল। করতাল বাজে, সঙ্গে কাঁকন পরা হাতের মিলিত করতালি। নেচে ওঠে দেহ-মন। মাধুর্যঘন পরিবেশে বসন্তের রঙে রঙিন করে বর্ষবিদায়ের আয়োজন চলে সমগ্র মালোপাড়া জুড়ে।

নৌকাকে সজীব আত্মার আধার বলে এখনও বাংলার জেলেরা যে বিশ্বাস করে তা আগেই দেখেছি। এই কল্যাণকামী আত্মা শুধু জীবিকার সংস্থানই করে না, নদী-সমুদ্রে নানা বিপদ থেকে সে আরোহীদের রক্ষা করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছেও দেয় বলে তাদের বিশ্বাস। এই লোকবিশ্বাস থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নৌকা নির্মাণের সময় সম্মুখ-গলুইয়ের দু'পাশে দুটি উন্মীলিত চক্ষু এঁকে দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে সুপ্রাচীন কাল থেকেই। দক্ষিণ ভারতের তামিল উপকূলে ও শ্রীলঙ্কাতে প্রচলিত নৌকার চক্ষু উন্মীলনের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ মেলে। বাংলার মাঝি-মাল্লারা সম্মুখ গলুইয়ে সিঁদুর-হলুদ-ফুলমালা-ধূপ সহযোগে নিয়মিত পুজো দেওয়ার পাশাপাশি অমাবস্যার দিন বিশেষ পুজোর আয়োজন করতো। কখনও কাঠের উপর চোখ খোদাই, কখনও রঙ দিয়ে চোখ আঁকা, কখনও পিতলের পাত কেটে চোখ জুড়ে দেওয়ার রীতি বাংলায় দেখা যেত। এই সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস ও রীতিনীতি প্রাচীনকালে মিশরেও প্রচলিত ছিল। মৃত ফ্যারাওদের শবদেহ বহনকারী নৌকায় এমন চক্ষু আঁকার রীতির প্রমাণ মেলে। পরবর্তীতে গ্রীক-রোমানদের মধ্যেও এই রীতি ও তৎসংক্রান্ত উৎসবের চল ঘটে।

অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে দীঘা ও সংলগ্ন উড়িষ্যা উপকূলের মাঝি-মল্লাদের মধ্যে এমন অদ্ভুত বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেছে। 'পাতিয়া' নৌকাকে তারা জীবন্ত আত্মা বলে বিশ্বাস করে। দীঘা-উড়িষ্যা উপকূলে নৌকা দেবিকা কালি হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই পাতিয়ার অগ্রভাগে কালিকার প্রতিনিধিত্বকারী মুণ্ডু খোদাই করা থাকে।[১৫] টেইলারের 'অ্যানিমিজম্' তত্ত্বের সার্থক প্রক্ষেপ যেন লক্ষিত হয় বাংলার জেলে-মাঝিদের দৈনন্দিন জীবনের এহেন বিচিত্র উৎসব-পার্বণগুলির উদ্‌যাপনের অন্তরে-অন্দরে।

এভাবেই প্রাচীন ভাব-বিশ্বাস ও আধুনিক সময় সঞ্জাত বর্তমান সংস্কৃতির মেলবন্ধন লক্ষিত হয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নিজস্ব-নির্মিত, নিজস্ব-পালিত ধর্মাচার-উৎসব-পার্বণগুলিতে। এগুলির উদ্‌যাপন তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বোধশক্তি জাগায়। গড়ে তোলে সু-প্রতিবেশীমূলক এক সম্পর্ক। ধীবর রমণীদের এসকল দেবদেবীত্ব-উৎসব-পার্বণগুলি তাদের সান্ত্বনা দেয় আর পুরুষদের সম্পর্কে উদ্বেগ ভুলতে সাহায্য করে। গৃহের স্বাভাবিকত্ব তাতে বজায় থাকে। উপকরণগুলি সজীবতাবোধ সেগুলির প্রতি গুরুত্ব বাড়ায়। তাই, সর্বোপরি দেবদেবী ও ধর্মাচরণ তাদের জীবনের গঠন বিন্যাসে পরস্পর বিজড়িত হয়ে আছে।[১৬]

বর্তমানে জেলে-মাঝিরা আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে জীবিকাতে কাজে লাগিয়েছে। তবে উৎসব-পার্বণ পালনের, আচারানুষ্ঠান পালনের ব্যাপারে এখনও তারা আদিমতায় বিশ্বাসী এক সম্প্রদায়। এর কারণ হিসাবে সূচনাতেই বলা হয়েছে যে, তাদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তাদের প্রাচীন বিশ্বাসগুলিকে লালন-পালন করে চলেছে। তাই আদি যুগ হতে এই ধর্মাচরণ বা আচারানুষ্ঠান পালনে তাদের তেমন কোন পরিবর্তন নেই। এই ঘটনাপ্রবাহগুলি পুনরায় প্রমাণ করছে যে, আজ পরিবেশ অবক্ষয়ের যুগ। মাছ ও জলের সংকটে জর্জরিত মানবসভ্যতা। শুকিয়ে যাচ্ছে খাল-বিল, নদী-নালা, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আজ অবলুপ্তির মুখে। ধীবরেরা তাদের প্রাচীন পেশা হারিয়ে দিশেহারা।[১৭] বর্তমান সময়ে, হয়তো তাই তাদের এসকল লৌকিক সাংস্কৃতিক কাঠামোগুলি ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ছে। কালের নিষ্ঠুর পরিহাসে তা যেন অপ্রয়োজন - অবলুপ্তির করাল গ্রাসে পতিত না হয়! বাংলার জেলে-মাঝিরা যে এলিট ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত নয়; তারা যে বড়ই অচর্চিত, বড়ই অবহেলিত; ঠিক তাদের সংস্কৃতিগুলির মতোই।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. Bikash Roychaudhuri, The Moon and Net: Study of the Transient Community of Fishermen at Jambudeep, Kolkata 1980, p. 112।
২. S. K. Pramanik, Fishermen Community of Coastal Villagers in West Bengal, Jaipur, 1993, pp - 105-106।
৩. S. Bhakthavatsala Bharathi, 'Spirit Possession and Healing Practices in a South Indian Fishing Community', Man in India, 1993, 73(4), p. 343।
৪. Sutapa Chattopadhayay, Colonial Agrarian Policy and Socio-Cultural Changes in the Sundarbans, Ch. III, pp. - 39-76, Unpublished PhD Dissertation, CU, 2000।
৫. বিকাশ রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২০-১২৩।
৬. এস. কে. প্রামাণিক, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৮-১১০।
৭. বিকাশ রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১৭।
৮. এস. কে. প্রামাণিক, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৭।
৯. ঐ, পৃ. ১০৮।
১০. ঐ, পৃ. ১০৬।
১১. গোকুল চন্দ্র দাস, 'বাংলার নৌকা, প্রাক্ ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগ', কোলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৪০-৪১।
১২. অদ্বৈত মল্লবর্মন, তিতাস একটি নদীর নাম, বাংলা ১৪১৫, পৃ. ২৮৫।
১৩. গোকুল চন্দ্র দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৪১।
১৪. বিকাশ রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১৫।
১৫. গোকুল চন্দ্র দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৪১।
১৬. এস. কে. প্রামাণিক, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১১-১১৩।
১৭. Surjendu Dey, Fishermen of the Coastal Districts of Bengal: A Study in Socio-cultural Transformation, Purushottom Publishers, Kolkata, 2012, pp. - 74-83।

লেখক : শিক্ষক, গবেষক, বেলুড় বিদ্যামন্দির।